International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-III, November 2017, Page No. 42-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত অন্ত্যজশ্রেণির অবস্থান ও পরিচয়

সাগর সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার, ভারতবর্ষ

Abstract

In the Bengali society, the division of the nation has been based mainly on Religion occupation family and livelihood. Various types of Backward Classes are found in Mangalkavas in Bengali literature. The caste sudra varna is located at the bottom of the characteristic side. This Sudra Varna has been created by the people of marriage within different castes. Again, different castes-tribal communities have been created through the adoption of different occupations. As a profession, becoming a caste, the diversity of the society has increased.

The people belonging to the tribal class mentioned in Mangalkavya, kirat, potter, sweet potato, goat, trout, Tantra merchant, Tambul merchant, Teli, Dhopa-napit, Bagdi, Namasudra, Bauri, Vaidya, Kadhi, Sutradhar, Kumva Bonik, Swrnakar, Hari, Sadgop, Pattani, Coach, Modak, Baiti etc.

People who are belongs in the lowest stage of the society are known as Harijans, Dalits. Educated people and higher society always avoid them. In 1930, people of this class became aware of their rights. Many scholars came forward to remove this untouchable. The restrictions which were previously imposed on lower classes of the lower classes were actually inhumane and cruel. But today's presence of people of the lower house remains in our society.

Key Words: Caste, Bengali society, Backward Class, Mangalkavya, occupation.
Article DOI: 10.29032/IJHSSS.v4.i3.2017.1-10

বাঙালি সমাজে জাতির শ্রেণি বিভাজন তা মূলত ধর্ম-কর্ম-বংশ ও জীবিকা গত থেকে করা হয়েছে। বর্ণগত দিক থেকে একেবারে তলানিতে অবস্থিত শূদ্র। এই শূদ্র বর্ণের সাথে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা বিভিন্ন বর্ণসংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির অবলম্বনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এক একটা বৃত্তি এক একটা জাতিতে পরিণত হয়ে সমাজের জাতি বিন্যাসের বৈচিত্র বাড়িয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের প্রয়োজনে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ গড়ে তুলে বর্ণহিন্দু থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব, জীবন যাপন প্রণালী, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীবিকার উপর নির্ভর করত। কিন্তু বর্তমানে এই ধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন অনেকেই পূর্বপুরুষের বৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে জীবন যাপন করে এমনটা নাও হতে পারে। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত যে সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে তারা প্রত্যেকেই সমাজের পিছিয়ে পড়া জনজাতি। এই প্রবন্ধে তাদের অবস্থানও পরিচয় বিষয়ে অনুসন্ধান মূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রথমেই একটি তালিকা দেওয়া যাক মঙ্গলকাব্যের অন্ত্যজ শ্রেণির জনজাতির-কর্মকার,

কিরাত,কুম্ভকার, গন্ধবণিক, গোয়ালা, তন্তুবায়, তন্তু বণিক, তাম্বুল বণিক, তেলি, ধোপা-নাপিত, বাগদি, নমশূদ্র, বাউরি, বৈদ্য, ব্যাধ, সূত্রধর, কাংস্য বনিক, সুবর্ণকার, হাড়ি, সদগোপ, পাটনী, কোচ, মোদক, বাইতি প্রভৃতি।

নানা ভাষা নানা পরিধান, নানা ধর্মময় ভারতবর্ষে বহু জাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। সেই দেশেরই অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ। সেখানে বসবাসকারী বাঙালি জাতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদাযের সমন্বয়। বাঙালি জাতির উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে জাতি তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই শিকড় অনুসন্ধান করতে গেলে ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ব, বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে উপর নির্ভর করতেই হয়। আজকের যে সুসংহত বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে তা বিদেশি, বিজাতি, বিভাষী, শাস্ত্র-সংস্কৃতি, জীবন জীবিকা সম্পৃক্ত জীবন চর্যাকে গ্রহণ করেই গড়ে উঠেছে। নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অন্য রকম হলেও তার ব্যবহারিক জীবন উত্তর ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি প্রসূত। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল। বাঙালির রক্তে বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে তাই নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' বাঙালিকে যে ৩৬টি জাতিতে বিভাজন করা হয়েছে তা মূলত জীবিকা গত দিক থেকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায় বাঙালির বিভিন্ন জাতি সৃষ্টিতে নেগ্রিটো-আদি অস্ট্রোলিয় ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রন ঘটেছে বেশি। অনেক নিম্নবর্গীয় জাতি ছিল যারা এক সময় সসম্মানে সম্মানজনক স্থানে ছিল আজ আর তাদের সেই স্থান নেই। আবার এমন অনেক জাতি রয়েছে পূর্বে তারা বর্বর, অসভ্য, অবজ্ঞেয় হলেও এখন যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করছে।

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত যে সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে তারা সকলেই বর্তমানে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি মধ্যে পড়ে বলেই মনে করা হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে তপসিলী কারা? মনে করা হয় যারা—

- হিন্দু সমাজের বিধান অনুযায়ী সমাজের নিচু স্তরের অবস্থান করে।
- যাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন খুবই কম।
- যাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক সরকারি চাকরি করে।
- যাদের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কম।
- আর্থিক দিক দিয়ে যারা খুবই অনুন্নত।

আধুনিক ভারতে তফসিলী কথাটি প্রথম ব্যবহার করা হয় সাইমন-কমিশনের ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে। সমাজের একেবারে নিচু তলার খেটে খাওয়া মানুষ যারা হরিজন, দলিত বলে পরিচিত। সভ্য মানুষ উচ্চশিক্ষা শিক্ষিত মানুষ এদের সর্বদা এড়িয়ে চলে। জ্ঞানের আলো থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখে নানারকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। তাই তারা ধীরে ধীরে পরিণত হয় অচ্ছুত জাতিতে। এদেরই স্পর্শ সভ্য সমাজ অপবিত্র মনে করে, অথচ এদের ছাড়া এক মুহূর্ত সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয়। সেকাল থেকেই একাল পর্যন্ত বাংলায নিম্নবর্গীয় জনজাতির সংখ্যা নেহাত কম নয়। নিম্নবর্গের অনেক জাতিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য যৌথভাবে 'পশ্চাদপদ শ্রেণি'-এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। আবার কোন কোন রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে রাষ্ট্রপতি আলোচনার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনজাতিকে পশ্চাৎপদ শ্রেণির আওতায় আনতে পারে এবং উন্নতির জন্য ভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিতে পারে। স্বাধীনোত্তর ভারতের ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয়। সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৬৬(২৪) নম্বর ধারায় তপশিলি জাতি এবং ৩৪২ ও ৩৬৬(২৪) নম্বর ধারায় তফশিলি উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে আর্থিক গত-কর্মসংস্থান গত এবং শিক্ষাগত প্রভৃতি দিক থেকে যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া তাদের প্রয়োজন বোধে রাজ্যসরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে তপশিলী জাতি,তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। মধ্যযুগের নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শ্রেণির উন্নয়নের কথা গুরুত্ব সহকারে আজকের মত ভাবা হতো না। তাদের উন্নয়নের জন্য লিখিত কোন সংবিধান ছিল না। ছিল না তাদের জন্য প্রণীত কোন আইন-কানুন। ফলে উচ্চ জাতির জনগোষ্ঠীর সর্বদা করে রেখেছিল পদদলিত। কিন্তু বর্তমানে সেই চিত্রটি পুরোপুরি বদলে গেছে। তাদের উন্নয়নের জন্য লিখিত সংবিধান রয়েছে। তাতেই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে সাম্যের অধিকার, অস্পৃশ্যতার নিবারন, সরকারি চাকরিতে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা, তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য ৩৩৮ নং ধারানুযায়ী কার্যনির্বাহী আধিকারিক নিযুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ১৭ নং ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যদি কোন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় বা তাকে অসম্মানিত করা হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা বিষয়ে আইন পার্লামেন্টে পাস করে তা কার্যকরী করা হয়েছে। সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণের জন্য যথাক্রমে ২৭ শতাংশ, ১৫ শতাংশ, ও ৭.৫০ শতাংশ হারে পশ্চাৎপদ শ্রেণির আসন সংরক্ষিত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে SC দের জন্য ২২ শতাংশ এবং ST দের জন্য ৬ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে।

বর্তমান অনগ্রসর শ্রেণির অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের একটা বিশাল অংশ ঔপনিবেশিক আমলে পশ্চাদপদ শ্রেণি বলে বিবেচিত হতো। মূলত পশ্চাদপদ বলতে সামাজিক অস্পৃশ্য মানুষদেরই মনে করা হতো। তাদের সম্পর্কে হরিজন, দলিত তপশিলীজাতি,নেটিভ শব্দগুলো ব্যবহার করা হতো। শব্দগুলোর ব্যবহারিত সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট করত। কিন্তু ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এই শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হোন। বহু যুগের বহুকালের অস্পৃশ্য দূরীকরণের জন্য বহু মনীষী ও মহাপুরুষ এগিয়ে এসেছেন। আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে মহাত্মা গান্ধী প্রথম অনুধাবন করলেন অস্পৃশ্য সমস্যাকে জাতীয়তাবাদী ভাব ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে অস্পৃশ্যতাকে দূরকরা যেতে পারে। এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য শক্ত হাতে হাল ধরতে এগিয়ে এলেন ডঃ বি আর আম্বেদকর। তিনি সাংবিধানিকভাবে অস্পৃশ্যদের অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করলেন বিভিন্ন সংবিধানের আইনগত ধারাগুলোর মধ্যে দিয়ে। বিধি লঙ্ঘনকারীদের কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও তিনি সংবিধানের পাতায় তুলে ধরলেন। স্বাধীন ভারতের ডঃ বি আর আম্বেদকরের উদ্যোগে অস্পৃশ্যতা বেআইনি বলে ঘোষিত হল এবং পশ্চাদপদ শ্রেণির উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন নীতি নির্ধারিত হল।

সমাজে পিছিয়ে পড়া জাতির সম্প্রদায়কে উন্নত করতে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। সংবিধানে বলা হয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্ত্রী- পুরুষ কোন নিম্নবর্গীয় জাতির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার্য রেস্তোরা ও হোটেল প্রমোদস্থান, স্নানাগার প্রভৃতি নিম্ন বর্গীয়দের প্রতি কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাবে না। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। কারণ সামাজিক নানা বাধার কারণে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ পিছিয়ে পড়ে তাদের উন্নতির জন্য শিক্ষা চাকরির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে এই শ্রেণি বিভাজন সঠিকভাবে কার্যকর হয়নি। কারণে অনেকেই নিজেদের বংশগত পরিচয় জলাঞ্জলি দিয়ে বর্তমানে চাকরির ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দু তারা তপশিলী জাতি তপশিলী উপজাতি শ্রেণিতে নাম লিখতে লাইনে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক পদমর্যাদা এখন আর তাদের মুখ্য বিষয় নয়। শুধুমাত্র জাতিগত শংসয়পত্র পাবার বা সংগ্রহ করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। এই ধরনের জাতির পরিবর্তন সমাজের নিম্নবর্গীয়দের কোন কাজে আসে না বরঞ্চ ক্ষতি করে। অর্থ ও ক্ষমতার লোভে যথাযথ একজন তপসিলী জাতি, তপসিলী উপজাতির প্রাপ্য অধিকারকে বঞ্চিত করে। কিন্তু যদি প্রশাসন গত দিক থেকে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া যায় তাহলে এই ভ্রষ্টাচার দূর করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলা, পঞ্চায়েতস্তরে যে সমস্ত সরকারি আধিকারিকগন রয়েছেন তাদের একযোগে স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে যাতে প্রকৃত নিম্নবর্গীয়রা তাদের প্রাপ্য সুবিধা গুলো পায়। শুধুমাত্র আইনগত বিধিনিষেধ দ্বারা কিছু হবে না স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইমানদারী দ্বারাই তা সম্ভব বলেই মনে হয়।

নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শ্রেণিরা বর্তমানে তপশিলী তথা দলিত বলে অভিহিত। পূর্বে অন্ত্যজশ্রেণি নিম্ন বর্গীয়দের উপর যে সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল তা ছিল প্রকৃতপক্ষে অমানবিক ও নিষ্ঠুর। ভদ্র সমাজের আচার-আচারণ অনুকরণ করা, পোশাক পরিচ্ছদ-পরিধান করা,তাদের সীমানায় বসবাস করা, জুতা পরিধান করা, অলংকার ব্যবহার করা অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। তৎকালীন সময়ে তাদের উপর বৈষম্য মূলক আচরণ করা হতো। স্বাধীন ভারতে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিতে তাদের অধিকার সুযোগ-সুবিধা দান করতে সরকারিভাবে আইনের মধ্যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবুও এখনও সমাজে দলিতদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ লক্ষ করা যায়। বিদ্যালয় দলিত শ্রেণির জন্য ছাত্রাবাস, খাবার টেবিল আলাদা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা মন্দিরে তাদের প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া, তাদের স্পর্শ জল না খাওয়া, সমাজের নিচু কাজে তাদের তাদের ডাক দেওয়া, প্রভৃতি এসব দেখে মনে হয় সমাজে এখনও শ্রেণি বৈষম্য টিকে রয়েছে। তবে জ্ঞান বিজ্ঞান, চেতনা বিকাশ ঘটায়, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন হওয়ায় এই শ্রেণি বৈষম্য আর পূর্বের মত প্রকট নয়। তবে শ্রেণিবৈষম্য যে বর্তমানে রয়েছে এ কথা বলা যেতেই পারে। তপশিলী জাতি সমূহের উপর শোষণ পীড়নের ফলেই জাতিগত বিবাদ-বিসংবাদের মতো ঘটনা ঘটে থাকে। উচ্চ ধনী সম্প্রদায় তাদের অর্থ-ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে গড়ে তোলে সশস্ত্র সেনাবাহিনী যারা প্রভুর একটু ইশারাতেই দলিতদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। দীর্ঘদিন অত্যাচারে অত্যাচারিত দলিত সম্প্রদায়েরা একসময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা একত্রে সংগঠিত হয়ে শোষণ-পীড়ন, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকার করে। পরিণামে তপশিলি জাতি সমূহের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সমাজের নিচুতলার মানুষের SC, ST, OBC হিসাবে বিভাজন করে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক উত্তরণের ব্যবস্থা করা হয় তা মূলত স্বাধীনোত্তর ভারতীয় ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। এই সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণিদের সংরক্ষণের আওতায় এনে বহু প্রকল্প মুলক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের উন্নতি প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। সমাজ তথা দেশকে প্রগতির পথে

এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক উন্নতি প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে বা সমাজে অশিক্ষা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক দলাদলি বাঁধার কারণ হয়ে উঠেছে। তাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অন্ত্যজ শ্রেণির এর নানা দিক থেকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সমাজের উন্নত জাতির সমগোত্রীয়তে পৌঁছাতে বিভিন্ন সরকারি সংরক্ষণমূলক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে তাদেরকে উন্নত করে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করা হচ্ছে। বৈচিত্রময় বাংলা জাতির মধ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রক্ষা করে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে এক দেশ-একজাতীয়তায় পরিণত করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত এই নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শ্রেণিটিকে সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে আর্থিক ও সামাজিকগত দাবি-দাওয়া পূর্ণ করে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিয়ে সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। ফলে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাদের মনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না ফলে তারা কোন সমাজ বিগর্হিত কাজে বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে শামিল হবে না। সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজদের সামগ্রিক উন্নয়নের একটা প্রচেষ্টা যার ফলে SC, ST, OBC জনগণ কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে সমাজের উন্নতির ভারসাম্য বজায় রাখবে। সংরক্ষণের সুবাদে তারা আইন সভায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে ফলে অতি অতিদ্রুত নিজেদের সমস্যা সমাধানেবিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। এতে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যত দিন সমাজে শ্রেণি বৈষম্য থাকবে ততদিন সমাজের বুক থেকে সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদ বিচ্ছিন্নতা দূর হবে না এবং সমাজে জাতির উন্নতি হবে না। সাম্য, সমানাধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ঐক্য, দলগত শ্রেণি বিভাগের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে তবে উন্নতি। শ্রেণিবিভাজন বিচ্ছিন্নতাবাদের মূলমন্ত্র। তাই তা দূর করে বিভিন্ন রকম সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় অনেকের কাছে প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে উঠেছে। ভারতের সংবিধানের বিশেষ সংরক্ষণ এর মধ্যে দিয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আনার ব্যাপক প্রচেষ্টা করেছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্গীয়দের উন্নয়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলি গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে-

মাসিক ও বাৎসরিক ভাতা প্রদান করা।
শিক্ষায় ভর্তির ব্যাপারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা করা।
Formal education ছাড়াও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা করা।

শিক্ষান্তে কর্মসংস্থানের উপযোগী বিভিন্ন ছোট খাটো ব্যবসা, কুটিরশিল্পের উদ্যোগের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করা। সামাজিক ক্ষেত্রে SC, ST, OBC এদের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্প গুলির মধ্যে দিয়ে তাদের উন্নয়ন করা যেতে পারে-

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতায় এনে যথার্থ প্রশিক্ষণ দিয়ে, তাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে যেতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে সমাজে যে সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামি রয়েছে তা দূর করে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের সেই প্রাচীন সনাতনী কু-প্রথা, কুসংস্কার দূর করে সভ্য সমাজের আলোতে নিয়ে আসতে হবে। দিতে হবে যথাযথ মর্যাদা।

সমাজে যে অন্ধ বিশ্বাস কুপ্রথা সনাতনী রীতি ঝাড়ফুঁক তুকতাকের নামে সমাজে যে ভ্রষ্টাচার রয়েছে আর তাকে যারা সযত্নে পালন করছে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানব জাতির ক্ষতি করছে,তাদের বিরুদ্ধে আইন করে সরকারি ব্যবস্থা নিতে হবে তবেই গড়ে উঠবে কুসংস্কারমুক্ত অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজ।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রদর্শনী নাটক লোকগীতি বিভিন্ন চলচ্চিত্রকে মাধ্যম করতে হবে। যেখানে সামাজিক কুপ্রথা গুলো রয়েছে তার উপকারিতা সম্পর্কে অসচেতন,অশিক্ষিত মানুষকে অবগত করে উপকারী দিকগুলো তুলে ধরতে হবে।

সমাজের কৌম গোষ্ঠিতে বসবাসকারী জনগণ এখনও তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা জানেই না সমাজে তাদের কি অধিকার, কি সরকারি প্রকল্প গুলো রয়েছে তাদের জন্য। সেই সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করে তুলতে সাহায্য নেয়া হবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দূরদর্শনের মত বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ব্যাপক প্রচার করতে হবে যাতে তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে অবগত হয়।

সমাজে তারা ব্রাত্য নয়। দেশ জাতি সমাজ অনেক কিছু তাদের কাছ থেকে আশা করে এই বোধ তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই কাজটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে নিঃস্বার্থ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে আসতে হবে।

নিম্নবর্গীয়দের উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করলে চলবে না। প্রয়োজন রাজ্যস্তর ও জেলাস্তরকে একত্রিত হয়ে একযোগে গৃহীত প্রকল্প গুলি বাস্তবায়িত করা। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে জাতি বর্ণের ঊর্ধ্ব ওঠে নিম্নবর্গীয়দের সর্বাঙ্গীন বিকাশ।

সমাজের একেবারে নিচু স্তরে রয়েছে যারা তারা মূলত আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া SC, ST, OBCসম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ। তাই তাদের চিহ্নিত করে গৃহীত সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান করা। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাসিক বা বাৎসরিক ভাতা প্রদান না করে তাদের বিভিন্ন কর্মুমখী বৃত্তিমূলক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রদান করতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নিম্নবর্গের উন্নতির জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হবে তা নিম্নরূপ—

১. রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে হবে।

২. রাজনীতি ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত করে ভোট প্রদানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শেখাতে হবে।

৩. আইন করে জনসংখ্যা অনুযায়ী তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দেবার জন্য সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হবে। শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের অনুযায়ী রাজনীতি নয় সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণ হবে মূল মন্ত্র যাত নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের গোষ্ঠীর সমস্যাগুলো উপস্থাপন করতে পারে এবং সংসদে প্রয়োজনীয় সমস্যা তুলে ধরে তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারে।

৪. শুধুমাত্র আইন করে নিম্নবর্গীয়দের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ, নির্বাচনে লড়াইয়ের আসন সংরক্ষণ করা নয়, প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যন্ত এলাকার নিম্নবর্গীয়দের উন্নতিতে সচেষ্ট হতে হবে। প্রয়োজনীয় এলাকাগুলিতে স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জীবিকা উপযোগী কর্মসংস্থানের ছোটখাটো কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা, আধুনিক প্রযুক্তিগত বিদ্যার সাথে পরিচয় ঘটানোর ব্যবস্থা করা, জীবনে তার মানকে আরও উন্নত করার জন্য প্রতিটি গ্রামীন এলাকাতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। প্রতিটি অনুন্নত এলাকাকে উন্নত করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব এক এক জন জননেতার নেওয়ার জন্য এগিয়ে এলে অবশ্যই একদিন বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী গুলো উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে।

৫. প্রতিটি অনুন্নত শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ব্যাক্তি স্বার্থ অতিক্রম করে বৃহত্তর স্বার্থে উঠে এসে উন্নয়ন কারীদের এগিয়ে চলার পথে পায়ে পা মেলাতে হবে। এই বৃহত্তর ও কাজে সরকারি সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উন্নয়নের রথে চাকা এগিয়ে চলবে।

মঙ্গলকাব্য বর্ণিত যে সমস্ত জাতি উপজাতির বর্ণনা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই সমাজের নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এবং বর্ণহিন্দুদের অবজ্ঞা-অবহেলা-ঘৃণার পাত্র হিসাবে নিম্নবর্গীয় সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় কৃষি, কারিগরি শিল্প, হস্তশিল্প ছোট খাট ব্যবসা ভিত্তিতে অর্থনীতির বৈচিত্র্যের মাধ্যমে এক এক জনগোষ্ঠী এক এক এলাকাভিত্তিক গড়ে তুলেছে এক এক জাতি ও উপজাতি। যারা নিজেরা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একে অপরের পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিল সুসম্পন্ন সমাজ। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় জাতিগোষ্ঠী গুলি বর্তমানে তারা প্রত্যেকেই তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্গত। তারা সমাজের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিয়ে তারা পিছিয়ে পড়া জাতি। এসমস্ত জাতিগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়-জাতি হল মূলত জন্ম ভিত্তিক এবং এক একটি জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত-যা জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত। গোষ্ঠীর সদস্যরা জন্মগত সূত্রে অভিন্ন এবং সমগোত্রীয়। জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যরা বংশানুক্রমিক সূত্রে প্রাপ্ত বিত্তি গ্রহণ করে থাকে। যেমন একটি শিশু যদি জেলের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তবে সে জন্মসূত্রে পিতার বংশের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতার বিত্তি ও পিতার বংশ মর্যাদা লাভ করে। সমাজের নিম্নবর্গীয় জনজাতির নিজস্ব কিছু লোকাচার, লোকধর্ম, লোকসংস্কার, সংস্কৃতি থাকে যা মেনে চলতে হয়। জাতিভেদ বা জাতিপ্রথা সামাজিক ব্যবস্থায় মধ্যেই সকলের কাছে জন্ম সূত্রে নির্ধারিত। অনেকে জাতপাত সম্পর্কিত ধারণাটিকে কর্ম-ধর্মের ওপর গুরুত্ব দিতে চান। পূর্ব জন্মে কোন কর্মের উপর মানবের জন্ম নির্ভর করে থাকো-তাই বর্ণহিন্দু উচ্চ শ্রেণির মানুষ নিম্নবর্গের মানুষকে অবজ্ঞা -ঘৃণা করে থাকে। বৃহত্তর অর্থে জাতি বা উপজাতি বলতে বুঝায় একই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর একই ভাষা, জীবনধারা,আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, প্রথা-রীতি-নীতি, জীবনশৈলীর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাই বলা যেতে পারে যে জাতি বা উপজাতি মূলত একটি অঞ্চল ভিত্তিক। বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে পেয়েছি এ সমস্ত উপজাতির অন্তর্গত নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজশ্রেণি গুলো নিম্নলিখিত অঞ্চলে

জোট বেঁধে একই বৃদ্ধি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কৈবর্তরা মূলত বসবাস করে মালদহ জেলার কালিন্দী ফুলহারা নদীর ধার বরাবর।

ডোম: মালদহ জেলার ডোম অধ্যুষিত এলাকাগুলি হল-ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদাহ, আইহো, মুচিয়া, নবাবগঞ্জ, মানিকচক, দক্ষিণ চন্ডিপুর, নাজিরপুর, রতুয়া, গাজোল, সৌদুল্লাপুর এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়।

হাঁড়ি জাতি: এরা মূলত বসবাস করে ইংরেজ বাজার, পুরাতন মালদা।

নমঃশূদ্র, চন্ডাল।

পাটনি: এদের বসবাসের স্থান-বামোনগোলা, হবিবপুর, গাজল এছাড়াও অন্যান্য জেলাতেও বসবাস করে।

কাহার জাতি: ইংরেজবাজার, নিদিয়া,ফুলবাড়িয়া,এনায়েতপুর,মানিকচক, শোভানগর,মথুরাপুর, এছাড়াও বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে।

বাগদী জাতি: এরা মালদা জেলার মূলত ইংরেজ বাজার, বাগবাড়ি, বাহান্নবিঘা, সামসী, মোহেদীপুর এ ছাড়া ওঅন্যত্রে বসবাস করে।

চামার-মুচি: পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার অন্তর্গত আইহো, বুলবুলচণ্ডী, পুরাতন মালদাহ, হরিশ্চন্দ্রপুর, এছাড়াও অনেকে জায়গায় বসবাস করে।

বারুই জাতি: পাকুয়া, মুছিয়া, আইহো এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গে কোন কোন জেলায় বসবাস করে।

গোপজাতি: মালদহ জেলা সহ অন্যান্য জেলাতেও দেখা যায় ।

কর্মকার জাতি: মালদাহের একবর্ণা, হরিপুর, আড়াই ডাঙ্গা মিল্কি, রতুয়া, অমৃতি, শোভানগর এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে এই জাতির বসবাস লক্ষ করা গেছে।

কুমোর জাতি: আইহো, বুলবুলচণ্ডী, বাচামারি, পুরাতন মামলা, মোথাবাড়ি, নাজিরপুর, এরকমই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বসবাস করে ।

ময়রা-রজক-নাপিত: মালদা জেলার প্রায় সর্বত্রই ওরা বসবাস করে।

মালি জাতি: মালদহ জেলার মূলত ইংরেজ বাজার, রাজনগর, বৈষ্ণবনগর, অমৃতি, মথুরাপুর, বুলবুলচণ্ডী, বাচামারি, অঞ্চলগুলোতে তারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে।(উল্লেখ্য সমস্ত অঞ্চলের যে সমস্ত জাতির উল্লেখ করা হলো তা মূলত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মালদা জেলা কেন্দ্রিক। নিজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথ্য সংগ্রহ) যে সমস্ত জাতি উপজাতি উল্লেখ করা হলো তারা শুধুমাত্র মালদা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বিভিন্ন পুস্তক থেকে জানা গেছে তারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকাতে কখনো দলবদ্ধভাবে আবার কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করছে।

মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জাতিভিত্তিক যে জীবন ধারা প্রচলিত ছিল বর্তমানে তা অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে। কারণ বর্তমান সমাজ মিশ্র অর্থনীতি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে উপজাতি গুলির জীবনধারা ও কার্যপদ্ধতি সহজসরল এবং সমরূপতা লক্ষণীয়। বৃহত্তর সংস্কার-সংস্কৃতি উচ্চধনী বর্ণহিন্দুদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র রেখে জল জঙ্গলে পরিপূর্ণ বাংলার গ্রাম অঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হতদরিদ্রের মধ্য দিয়ে কায়ক্লেশে কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। বর্তমান সমাজেও নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর একটা সিংহভাগই বসবাস করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে তবে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যাক নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষ আর্থিক স্বচ্ছলতা সুবাদে বসবাস করে বিভিন্ন শহরাঞ্চলে। গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষেরা যেহেতু শিক্ষা-দীক্ষায়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারতার অভাবে, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যথাযথ সুয়োগ-সুবিধা না থাকায়, বিভিন্ন অন্ধ লোকবিশ্বাস,কুসংস্কার, ঝাড় ফুকতাক, মাদুলি কবজে গাছ -গাছড়া বিশ্বাস করে। বর্তমান সমাজে এখনও সর্প দংশনকৃত মানুষকে মন্ত্রবলে বিষ নামানোর চেষ্টা করা হয়। ডাইনি অপবাদ দিয়ে এখনো সমাজের কিছু মহিলাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এখনো কোনো বিধবা মহিলার মুখদর্শন অশুচি বলে মনে করা হয়। কোন কোন জাতির সংস্পর্শে থাকা অথবা তাদের মুখদর্শন যাত্রাপথের অমঙ্গল বলে মনে করা হয়। এ সমস্ত বহু অন্ধ কুসংস্কার,লোকবিশ্বাস মানুষের মনে রয়েছে। অথচ এই গুলির মূলে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবুও নিম্নবর্গীয় মানুষের পরম্পরাগত সনাতনী প্রথা রুপে বিনা বিচারে মেনে আসছে। কিছু কিছু উপজাতির মধ্যে মধ্যযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আত্মার অস্তিত্ব, ভুত-প্রেত, যাদুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যার, কথা স্বীকার করে থাকে। অবশ্য এর মূলে রয়েছে সর্বপ্রাণতাবাদের ধারণা। তারা সমস্ত কিছুর মধ্যেই প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করে। তাই সকল কাজের কারণ হিসাবে তারা এক অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করে। তারা মনে করে আত্মা অমর, অপূর্ন ও অবিনশ্বর। এই অতৃপ্ত আত্মা পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে। তাই

বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি ঘটিয়ে ইহলৌকিক থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। তার জন্য তারা ভয়ানক সব আচার-আচরণ ক্রিয়াকর্ম বিধি বিধান পালন করে থাকে।

কৈবর্ত জাতি: বাংলা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম জনগোষ্ঠী হল কৈবর্ত। মালদা জেলার কালিন্দী ফুলহার, টাংগন, পুনর্ভবা নদী বিধৌত অঞ্চলে এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদী বিধৌত অঞ্চলে এই জনজাতির বসবাস রয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশে যে সমস্ত জনজাতি বসবাস করছে তাদের মধ্যে কৈবর্ত জাতি অন্যতম। কৈবর্তদের সাথে সামাজিক,সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য রয়েছে প্রটো-অস্ট্রোলয়েড জাতির কিন্তু শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। কৈবর্ত জনজাতির দেহের গঠন মাঝারি, মাথার চুল কালো, মাথার খুলি গোল। অনুমান করা যায় এই জাতিটির উৎস মূলত পশ্চিম গোলার্ধে কোন মানব গোষ্ঠীর। পিতা হলেন ক্ষত্রিয় এবং মাতা বৈশ্য বংশ জাত। এদের বিত্তি মৎস ধরা মৎস্য ও চাষ করা। তাদের কর্ম ভিত্তিক সমাজ ও সংগঠন কৌম নামে পরিচিত। কর্বট কোমের বংশধররা হলেন কৈবর্ত। বিভিন্ন পুরান,বিভিন্ন সংহিতায়, তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন কীকট, অশোকের শিলালিপিতে তারা কৈবর্ত নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার একটি অংশে কৈবর্ত জনজাতির একটি অংশ বসবাস করে। এছাড়াও কৈবর্তের মূলে যে ধারাটি মৎস্য শিকার, জলচর প্রাণী শিকার এর সাথে যুক্ত থাকে তারা 'মাল' নামে পরিচিত।

কোচ জাতি: অবিভক্ত বঙ্গ দেশে পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী এবং বিভক্ত বঙ্গদেশে উত্তরবঙ্গ মালদা, দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গাতে রাজবংশী, কোচ, পোলিয়া প্রভৃতি জাতির উল্লেখ পাই। মধ্যযুগে শিবায়নে কোচ জাতির উল্লেখ রয়েছে। কৃষক শিবও কোচ রমণীর প্রতি কামাসক্ত হয়েছেন। বিশেষ করে এই সমস্ত জায়গাগুলি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। জানা যায় কোচ, পোলিয়া বলে যারা পরিচিত তার মূল রাজবংশী জনগোষ্ঠী। বাংলাতে যে পূর্ব থেকে বহু কোচ জাতির বসবাস রয়েছে তা বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালি জাতির উৎপত্তি শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে স্পষ্ট।'বহুতর কোচ বাংলা ভিতর বসবাস করতেছি। দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, প্রকৃতি জেলায় বহু কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাংলার ভেতর প্রায় এক লক্ষ কোচ বসবাস করে।'’[১]

মনে হয় তারা দ্রাবিড়, অষ্ট্রিয়া, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর লোক। তবে নানা মত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে তারা মূলত সংকর জাতি। কোচ জাতির উদ্ভবের মূলে নেগ্রিটো এবং মঙ্গোলয়েড এর মিশ্রনে এক নতুন জাতি সৃষ্টি যা কোচ জাতি নামে স্বতন্ত্র জাতি গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়েছে।

বাঙালি জাতির শারীরিক গঠনে অবশ্যই ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতাকে অতিক্রম করেও বলা যায়-'প্রধান প্রধান ধারার সঙ্গে উপধারা মিলিয়া এক হইয়া বাঙালির জন সংকার্যের সৃষ্টি হইয়াছে।”[২] এ কথা ভুললে চলবে না।

আমরা সকলেই অবগত আছি জল জঙ্গলে পূর্ণ বাংলার সমাজ ছিল কৌম ভিত্তিক। কর্বট পরবর্তীকালে যা কৈবর্ত নামে পরিচিত হয়। এছাড়াও বাগদি, হাড়ি, ডোম, বাউড়ি, সকলেই ছিল কৌম ভিত্তিক জাতি। উত্তরবঙ্গের কোচরা এখনো নিজেদের রাজবংশী বলে দাবি করে থাকে। পৌরাণিক পুরুষ পরশুরাম তিনি ক্ষত্রিয় নিধন যজ্ঞ শুরু করলে কোচদের পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয় কোচেরা বাংলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে আত্মগোপন করে এবং আর্যবর্ত পরিত্যাগ করে। সেই সূত্রে বর্তমান কোচেরা নিজেদের ক্ষত্রিয় রাজবংশী বলে দাবি করে থাকে। নিম্নবর্গীয় কোচ যাদের সঙ্গে দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য করা যায়। যারা ছিল অন্ত্যজ শংকর। তারা এখন ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে এর মূলে অবশ্য রয়েছে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ও বর্ণহিন্দুর সংস্কৃতির সঙ্গে সহাবস্থান জনিত মিশ্রণ। গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে মৎস্য দেশে (বরেন্দ্রভূমি উত্তর সীমান্ত) বসবাসকারী মোঙ্গলীয়রা আজকের রাজবংশী নামে পরিচিত। কোচ নামান্তর রাজবংশীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। যেমন- হাইল, জাইলা, কোচ, পোলিয়া। বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে বর্নিত কোচ জাতিটি কিঞ্চিৎ মঙ্গোলীয় রক্ত মিশ্রণে দ্রাবিড়ীয় উপজাতিটি কোচ নামে পরিচিত। বর্তমানে কোচ নামান্তর রাজবংশীরা নিজেদের কোচ পোলিয়া বলে পরিচয় দিতে ঘৃনা বোধ করে এবং বর্মন, ভঙ্গক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় রাজবংশী নামে পরিচয় দিতে বেশি আগ্রহবোধ করে।

ডোম জাতি: বাংলাতে যে ডোম জাতির উল্লেখ রয়েছে তারা মূলত বিহার ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত। বাংলার জনজাতির সঙ্গে একত্রে বসবাসের কারণে তারা বাঙালি ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শহরের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় এবং গ্রাম বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। জাতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা অনুসারে তারা মূলত দ্রাবিড় বংশ থেকে উদ্ভূত এক অনার্য জাতি বিশেষ। বাংলাতে এরা বিশডোল, আঁকুড়ে, সাজানে, বাজুনে প্রভৃতি নামে পরিচিত। তবে তাদের বৃত্তিগত শ্রেণি বিভাজন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে তারা। লক্ষ্য করা গেছে ইহাদের ছেলেমেয়েদের শৈশব বিবাহ হয়। তবে বর্তমানে সরকারি বিভিন্ন আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকায় (১৮ বছরের নিচে বিবাহ

দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ), এছাড়াও সরাকারি নানা রকম সুযোগ সুবিধা থাকায়, শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক থাকায়, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী প্রকল্প উপলব্ধ হওয়াতে সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তিক সচেতনতা থাকায় এরা শৈশবে ছেলে মেয়েদের বিবাহ দেয় না। তবে মধ্যযুগে ধর্মমঙ্গল কাব্যে ডোমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষণীয়। ধর্ম ঠাকুরের উপর একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে শুধুমাত্র ডোমদের। ডোম পণ্ডিতরাই ধর্ম ঠাকুরের পুরোহিত। এছাড়াও কোন সামাজিক অনুষ্ঠান হলে ডোম পন্ডিত দ্বারা ।পূজার ক্রিয়াকর্ম সম্পূর্ণন্ন হয়। কিন্তু বর্তমানে অনেক এলাকাতেই ডোম জাতির বিভিন্ন পূজা পার্বণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ব্রাম্মণরা সাহায্য করে থাকে। সামাজিক এই যে পরিবর্তন তার মূলে অবশ্যই রয়েছে যুগগত পরিবর্তন ও তার প্রভাব। গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী ডোম জাতি নিজদের মধ্যে কলহ, বিবাদ, সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করলে দলপতি অপরাধীর অপরাধের বিচার ও করতেন। যদি অপরাধী উপযুক্ত কারণ না দেখাতে পারত তবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সমাজ চ্যুত করার নির্দেশ দিতেন এবং অপরাধীর কঠোর শাস্তি এবং আর্থিক জরিমানা অবস্থা করতেন। বর্তমানে কোন কোন জায়গাতে ডোম জাতির মধ্যে মোড়লের বিচারের বিরুদ্ধে সরকারি সাহায্য নিয়ে থাকে তবে শহরাঞ্চলে ডোমদের কোন সমাজপতি বা মোড়ল নেই। তবে সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন যেখানে সকলেই নাম লেখায় প্রয়োজনীয় কর্ব ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য।

অন্যান্য জাতির মত তাদের বার মাসে তেরো পার্বন নেই। ধর্ম ঠাকুরের পূজা তাদের প্রধান পূজা। এছাড়াও সূর্য পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, মনসা, কালি এবং বিভিন্ন ব্রত পালন করে থাকে। তারা যেহেতু বাঁশ জাতদ্রব্য হাতে বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাই শিল্পের দেব অস্ত্রের দেব বিশ্বকর্মা পূজা করে থাকে। ধর্ম ঠাকুরের প্রথম পুরোহিত রামাই পন্ডিত আবার অনেকের মতে ধর্মমঙ্গলের উল্লেখ্য কালু ডোম হল ডোমদের প্রথম পুরোহিত। ব্রাহ্মণ জাতির মতোই ডোম পণ্ডিতদের সামাজিক মর্যাদা উচ্চেছিল ডোম সমাজে। পন্ডিত ডোমরা সাধারণত অপণ্ডিত ডোমের বাড়িতে জল স্পর্শ করত না। ডোমদের বিভিন্ন সামাজিক আচার,পূজা-পার্বণ এদের দ্বারাই সম্পন্ন হতো। মৌখিকভাবে জানা গেছে যে ধর্ম ঠাকুরের পূজার পুরোহিত সবাই হতে পারে না। একমাত্র তাম্র ধারণকারীরাই সাধারণত রামাই পন্ডিতের বংশোদ্ভূত যারা তারাই পাড়ে। তবে বর্তমানে অনেক জায়গায় এই নিয়মের অনেক ব্যাতিক্রম লক্ষ করা গেছে আধুনিক সমাজ সংস্কারের প্রভাবে। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গে যে সমস্ত ডোম জাতি রয়েছে বাগদি জাতির লেট শ্রেণির পুরুষ। চন্ডালিনী পুত্র কালু বীরকেই তাদের আদি পুরুষ বলে থাকে। তার চার পুত্র থেকে চার শ্রেণিরর ডোমের উৎপত্তি। যথা-আংকুরিয়া, বিশডোলিয়া, মুগহিয়া, বাজুনিয়া। ধর্মমঙ্গলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে ডোম সম্প্রদায় ছিল সমাজের ঐতিহ্যপূর্ণ এবং সামাজিক মর্যাদা পূর্ণ স্থানের অধিকারী জাতি। কাব্যটিতে কালু ডোমের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"বীরসিংহের পুত্র আমি গজ সিংহের নাতি
এ সাত পুরুষ হইল নিবাস রমত।
আমায় সংহতি আছে তের ঘর ডোম
সাগরে জল কাঁপে হইল যাহা বিক্রম।"[৩]

কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ার জন্য এই জাতিটি ধীরে ধীরে সমাজের একেবারে তলানীতে এসে কুলো, ডালা, ঝুরি হাঁস-মুরগি, শুকর পালন, শহরাঞ্চলে পয়ঃ প্রণালী, রাস্তাঘাট পরিস্কার করে এবং শব দেহ দাহ করে কোনোক্রমে বেঁচে থাকে। তবে বর্তমানে এই জাতিটিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতির জন্য সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারিভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কিছু কিছু পদে তাদেরই শুধুমাত্র নিয়োগ বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই কম বেশি ডোম জাতির জনবসতির হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে ডোম এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জাতি। চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমান সাহিত্যে এ জাতির উজ্জ্বল উপস্থিতি জাতিতত্ত্বের ইতিহাসে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। বর্তমানে এরা তপশিলী জাতির অন্তর্গত। তবে পূর্বেও তারা কোনো কোনো সময়ে সমাজে অচ্ছ্যুত জাতি বলে অভিহিত হতো তার নিদর্শন চর্যাপদ রয়েছে।

"নগর বাহিরি ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাসি বামহন নাড়িয়া।।"[৪]

কিন্তু প্রাচীন যুগের সমাজে ডোম জাতিকে হেয় করা হলেও মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলকাব্যে ডোম জাতিকে কিন্তু সামাজিক উত্তরণ ঘটিয়ে রাজ সেনাপতির কাজে নিযুক্ত করে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

"বীর কালু না মোর ময়নাতে ঘর।

চিরকাল মহামতি সেনের চাকর।।"[৫]

আবার যুদ্ধক্ষেত্রেও ডোম জাতি বীর বিক্রম-পরাক্রমশীল রূপ কালু ডোমের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—

"দলবল রাজার যতেক ছিল সেনা।
বীর কালু দেখি সভাই এড়েয়ানা।।
লস্কর চঞ্চল হইল কালু সিংহ ডরে।
পদ্মপত্রে জল যেন টলমল করে।।"[৬]

পাটনী জাতি: দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত একটি শাখা পাটনি নামে পরিচিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে জাতি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। ঈশ্বরী পাটনী সে খেয়া পারাপার করে। নিতান্ত সহজ-সরল জাতিটি নদী তীরবর্তী এলাকায় অর্থাৎ গাঙ্গেয় নদী তীরবর্তী অঞ্চলে অবিভক্ত বাংলাদেশে ব্যাপক হারে এই জাতির বসবাস ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেশ বিভাজনের পর তারা মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করছে। এরা আদিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী থাকলেও কেউ কিউ আবার ধর্মান্তরিত হন। নদী ও নৌকাকে তারা ভক্তিসহকারে পূজা করে কারণ এরই উপর তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। তাদের জলদেবী 'খল কুমারী'এই দেবীর পূজা তারা শ্রাবণ মাসে ভক্তি সহকারে করে থাকে। মালদহ জেলার পুরাতন মালদাহ, হব্বিপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল, সর্বত্রই তাদের বসবাস রয়েছে বলে জানতে পেরেছি।

বর্তমানে তাদের ছেলেমেয়েরা পূর্বের থেকে শিক্ষা-দীক্ষা অগ্রগতি লাভ করেছে। পূর্বের মত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক শ্রেণিগত বিভাজন তাদের কাছে প্রকট নয়। তারা অনেকটাই এখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় জীবন যাপন করে। ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার, বিভিন্ন প্রথা-রীতিনীতি ও অনেকটা লঘু হয়েছে।

চন্ডাল জাতি: মনে করা হয় চন্ডালরা ছিল দ্রাবিড়ীয় কুলজাত আদিম সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠী। স্বাধীনচেতা এবং ক্ষত্রিয়দের মত প্রবল পরাক্রমশালী লড়াইয়ে পারদর্শী। ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতকের পুরান সাহিত্যে তারা অস্পৃশ্য হিসেবে পরিগণিত হয় নি কিন্তু পরবর্তীকালে তারা অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হতেন বলে উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ গুলিতে। জাতকে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে চন্ডালরা পৃথিবীর অন্যতম হীণ জাতি। কথিত আছে এদের স্পর্শ দোষের, এদের প্রতি দৃষ্টি চোখ কুলুষিত হয়। এও কথিত আছে যে, যে খাদ্য বা পানীয় চণ্ডালের চোখ পরেছে তা খাওয়া চলবে না। সমাজে তাদের প্রতি ঘৃণা উচু জাতের মানুষের বরাবরই ছিল। মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে তার প্রমাণ রয়েছে। সাধারণত শব দেহ দাহ করা, শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী বধ্যভূমিতে দোষী কে বধ করা, এরকমই বিভিন্ন নির্মম-নির্দয় কাজে তারা নিযুক্তি হতেন। জ্ঞানী লোকের স্পর্শে না আসায় তারা সর্বদাই ছিল গুনহীনও নীতিবর্জিত। মধ্যযুগের কিছু মহাপুরুষের আবির্ভাবে তাদের প্রতি ঘৃণার ভাব দূর করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি প্রথম ঘোষণা করেন একজন ব্রাহ্মণ থেকে একজন হরি ভক্তি পরায়ণ চন্ডালই শ্রেষ্ট। তার এই বার্তা সমাজের বিভিন্ন নিম্নবর্গীয় জাতির মধ্যে ঘৃনাভাব দূর করে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মানবতাবোধকে দীপ্ত করে। পরবর্তীকালে তাঁর এই ধারাটিকে টিকিয়ে রেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ সহ অন্যান্য মনীষীরা। তাই বর্তমানে এই জাতিটি পূর্বের মত অতটা ঘৃণিত নয়। তারা এখন শিক্ষার আলোয় আলোকিত। তাঁদেরর মধ্যে শিক্ষা গ্রহনে সচেতনতা বেড়েছে, বেড়েছে নারী শিক্ষার প্রচলন। তাদেরই স্পর্শজনিত দোষ এখন সমাজে অতটা প্রকট নয়। তারা এখন সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। তারা বিভিন্ন পূজা পার্বণ আচার অনুষ্ঠানও পালন করে।

হাঁড়ি জাতি: বাংলা অতি প্রাচীন জাতি। কারণ নাত সাহিত্যে এদের উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গদেশে তথা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই কমবেশি এই জাতির বসবাস রয়েছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজন গত বৈচিত্র্যও রয়েছে। যথা-বড় ভাগিয়া, মধ্য ভাগিয়া, শিউলি, মেথর, প্রভৃতি তবে এদের এই শ্রেণিবিভাজন কর্মগত জীবিকার ওপর ভিত্তি করে বিভাজিত করা হয়েছে। বীরভূম জেলাতে হাঁড়ি সম্প্রদায় মূলত ভূঁইমালি, কাহার, দাই, মেথর, শ্রেণির রূপে বিভাজিত। সমাজের ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় অস্পৃশ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত বলে তথাকথিত উচ্চ সমাজের মানুষ তাদের ছোঁয়া জিনিস স্পর্শ করত না। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম বিরচিত 'অভয়া মঙ্গলকাব্যে' উল্লেখ রয়েছে এই জাতিটি ঘাস কেটে জীবন ও জীবিকা নির্ভর করত। আবার 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' হাঁড়িঝি কাহিনীর উল্লেখ পাই। তবে দেখা যায় ইনি তন্ত্র সিদ্ধা হাঁড়ির কন্যা বলে উল্লেখ রয়েছে। এদের সামাজিক আচার-আচরণ, বিবাহ পদ্ধতি, উচ্চবর্ণ থেকে কিছুটা আলাদা। বর্তমানে তারা অনেকেই শাক্ত বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী। এছাড়াও তারা কালী ধর্মরাজ, শিব, লক্ষী দেবীর, পূজা করে থাকে। তৎকালীন সমাজে হাঁড়ি জাতি সামাজিক দিক দিয়ে নিম্নবর্গীয় হলেও লোকবল অর্থবল দ্বারা রাজা মহারাজা জমিদারে পরিণত হয়েছিল। তার প্রমাণ অবশ্য ইতিহাসে রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার এক রাজা ছিলেন নাম ফতেহ সিং হাজরা যিনি জাতিতে হাঁড়ি ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ তাদের বসবাস হলেও মালদাহ জেলা ইংরেজবাজার পুরাতন মালদহে তারা বসবাস করে।

কাহার জাতি: পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই জাতিটি বসবাস করে। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মত প্রচলিত রয়েছে। পিতা ব্রাহ্মণ মাতা চণ্ডাল রক্তের মিশ্রণের ফলে কাহার জাতির সৃষ্টি। পূর্ব থেকেই জাতিটি কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। বাংলায় কাহারা ডুলি বলে পরিচিত। মধ্যযুগে তারা পালকি বাহকের কাজ করতো কিন্তু এখন তারা কেউ কেউ কৃষিকাজ এবং মুটে মজুরের কাজ করে থাকে। মালদহ জেলায় যে সমস্ত কাহার জাতির বসবাস রয়েছে তাদের মধ্যে চারটি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ্য করা গেছে। যথা বামানি, চুরি বান্না, পশ্চিমা মুসাহর। বর্তমানেও তাদের অবস্থার উন্নতি হয়ে ওঠেনি। গ্রাম্য পরিবেশে মাটির টালির ছাউনি, টিন-চাটাইয়ের বেড়া, মাটির দেওয়াল এরকম বসবাসের যোগ্য ঘরে তারা বসবাস করে। পোশাক-পরিচ্ছদে এখনো আভিজাত্যের ছাপ আসিনি। অতি সাধারণভাবে তারা জীবন যাপন করে। তবে আধুনিকতার ছোঁয়া একটু একটু করে লাগতে শুরু করেছে। বর্তমানে তারা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে পা বাড়াচ্ছে। নিম্নলিখিত জায়গায় তাদের বসবাস রয়েছে বলে জানা গেছে।

ইংরেজ বাজার - শোভানগর, এনায়েতপুর।
মানিকচক - মথুরাপুর,মাদিয়া,শিবন ডোলা।
রতুয়া - পুখুরি, সামসী, আড়াই ডাঙ্গা এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আরো অন্যান্য জায়গায় তারা বসবাস করছে।

বাগদী জাতি: বাংলার প্রাচীন জাতির মধ্যে বাগদি একটা অন্যতম জাতি। এদের অন্য নাম বগধ। তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও শারীরিক বর্ণ দেখে তাদের আদিবাসীর ও দ্রাবিড়দের সমগোত্রীয় বলে অনুভূত হয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বাগদি জাতিতে অসৎ শূদ্র পর্যায়ভুক্ত বজায় ছিল। বাংলায় বাগদি জাতির মধ্যে তিনটি শ্রেণি রয়েছে। যথা- তেঁতুলিয়া, ডুলিয়া, উত্তর ওয়াবী। কিন্তু বর্তমান মালদা জেলাতে বাগদী জনগোষ্ঠীর চারটি শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। জানা গেছে বাগদী, বাউরি, বাউরি-বাগদি, মাহিষ্য বাগদি। মঙ্গলকাব্যে অন্তর্গত ধর্মমঙ্গল কাব্যে রুপ রাম চক্রবর্তী তাঁর বাগদি জাতির উল্লেখ থেকে মনে হয় তারা পূর্বে ছিল যোদ্ধার জাত। রাজার শাসন কার্যে তারা হাত লাগাতো এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বীর বিক্রমে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন।

“মুরারী বাগদি সাজে যমের সমান।
ধনুকে চামর বান্ধা রাজার নিশান।।”[৭]

পশ্চিমবঙ্গে বাদীদের বসবাসের স্থান গুলি হল-বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর। তবে মালদা জেলার নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে তারা বসবাস করে।

ইংরেজবাজার - বাগবাড়ি, বাহান্ন বিঘা।
হরিশ্চন্দ্রপুর - চেলাই মোড়, বেদেনী টোলা, এছাড়াও গোলাপগঞ্জ, চাঁচোল, ভালুকা বাজার।

তেঁতুলিয়া নামক বাগদি শ্রেণি তারা নিজেদের বাদীদের মধ্যে উচ্চবংশজাত বলে দাবি করে থাকে। তাহাদের তাই সামাজিক মর্যাদা বেশি। বাগদীরা ধর্ম ঠাকুরের পূজা করে থাকে। এছাড়াও বর্তমানে তারা দুর্গাপূজা,কালীপূজা, লক্ষী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা, চন্ডী নামক বিভিন্ন মঙ্গল কারিণী দেবীর পুজো করে থাকে। জন্মগত সূত্রে এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখনো বিশ্বাস করে যে তারা পার্বতী গর্ভে শিবের ঔরসজাত। আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখ আছে যে তাদের আদি পুরুষ ক্ষত্রিয় ও মাতা বৈশ্য। বর্তমানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন আর পূর্বপুরুষের বিত্তির উপর নির্ভরশীল নয়। কর্মের সন্ধানে অনেকেই ভিন রাজ্যের মজুরি করতে বের হয়। অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে যায় আবার অনেকে ‘দাদন’নিয়ে যায়। সমাজে এখনও তারা মুরুব্বী গ্রামের মাতব্বরদের কথা মেনে চলে। বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত হলে প্রাথমিক ভাবে মীমাংসা গ্রামের মাতব্বর-ই মিটিয়ে থাকে। তবে অনেকেই বর্তমানে আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। সামাজিক সমস্যা গুরুতর হলে তারা শহরে গিয়ে সরকারি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পূর্বে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় চিরাচরিত প্রথা মত ওঝা, বৈদ্য এদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হতো কিন্তু এখন এই ধারনার অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক সচেতন হয়েছে। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকাতে শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকায় অস্বাস্থ্য পরিবেশের বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই এবং বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় জাতিটি নানা দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছে।

রজক বা ধোপা জাতি: সভ্য সমাজ গড়ে ওঠার সময় থেকেই বাংলায় বস্ত্র বিধৌত করন পেশাটি প্রচলিত ছিল। বিশেষত বর্ণ হিন্দুরা তাদের নিজেদের বস্ত্র সমাজের এক শ্রেণির মানুষকে দিয়ে পরিষ্কার করাতেন আর যারা করতেন তারা পরিচিত হলেন ধোপা বা রজক নামে। জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে অনেকে মনে করে তারা নেতা মুনি বা নেতা ধোপানীর বংশধর। মনসা মঙ্গলে যে নেতা ধোপানীর উল্লেখ আছে সে সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত আছি। বিশেষ অনুসন্ধান করে জানা গেছে তাদের মধ্যে অনেকেই দাবি করেন তারা তাঁর-ই বংশধর। মালদাহ, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর হুগলি জেলার, বিভিন্ন জায়গায় এছাড়াও পশ্চিমে প্রায় সর্বত্রই এরা বসবাস করে। সামাজিক গত অবস্থান দিক থেকে পূর্বে ছিল তারা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক। বস্ত্র ধৌতকরন জীবিকার ওপর ভিত্তি করে অনুন্নত পরিবেশে অশিক্ষা- কুসংস্কার এর মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে। তারা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজিত ছিল। মধ্য বাংলাতে ছিলো সতিশা,অতিসা, হাজরা সমাজ,নিতিসিনি। এদের মধ্যে সতীশা,অতীশা শ্রেণির ধোপারা ছিল সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। তারাই তাদের সমাজের নানা নিয়ম-নীতি,শান্তি-শৃঙ্খলা অনেকটা নির্ধারণ করতো। তাদের মধ্যে সামাজিক নিয়মকানুন ভঙ্গকারীদের সমাজচ্যুত করারঅবস্থা ছিল। হাজরা সমাজের কিছু মানুষ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করায় তাদের সমাজ চ্যুত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তারাএক স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেছিল। এভাবেই ধোপাদের মধ্যে বিভিন্নশ্রেণি বিভাজন দেখা গেল।

বাল্যবিবাহ, কন্যপণ, বহুবিবাহ, প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদের, কোন মতেই মেনে নেওয়া হতো না। তাই পদাবলীর চন্ডীদাস ও বিধবা রজকিণী রামীর প্রণয় সমাজ অস্বীকৃতি দিয়ে পরকীয়া প্রণয় বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সরকারি আইন মেনে চলায় তাদের মধ্যে এখন আর বাল্যবিবাহ লক্ষ করা যায় না। বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আগে তুলনায় তারা একটু সচ্ছল। শুধুমাত্র বৃত্তিগত দিক দিয়ে বস্ত্র ধৌত কাজে আর নিয়োজিত নেই। সমাজের অন্যান্য জাতির মত তারাও বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে থাকে। বিভিন্ন উচ্চবর্ণের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে ।

কর্মকার শ্রেণি: একাধিক মঙ্গলকাব্যের যে শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে তারা হলেন কাঠের কর্মে নিযুক্ত কর্মকার শ্রেণি। প্রাচীনকাল থেকেই তারা অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাণ, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করে সমাজে একটা আদরণীয় স্থান করে নিয়েছেন। পূর্বে তারা 'কর্মার' নামে সমাধিক পরিচিত হতেন। তা থেকেই বর্তমানে কামার বা কর্মকার কথাটি এসেছে। ধরে নেয়া হয় তাদের আদি পুরুষ ছিলেন বিশ্বকর্মা এবং শূদ্রাণী মাতার সন্তান হলো এই কর্মকার সম্প্রদায়। তৎকালীন সমাজের এই শ্রেণিটি নিজেদেরকে দেডব পুত্র বলে গর্ববোধ করতেন। তাই সমাজে তাদের মর্যাদা পূর্ণ স্থান ছিল। বিশ্বকর্মার নয় জন পুত্রই ছিল শিল্পী। তাদের মধ্যে কর্মকার অন্যতম। তৎকালীন শিল্পগন তাদের শিল্পকর্মের জন্য বিশ্বকর্মা বলে অভিহিত হতেন। ধীরে ধীরে তাদের সামাজিক মর্যাদা লোপ পায়। তৎকালীন কর্মকার শ্রেণির বিভিন্ন মানুষ নানা রকম অনুসন্ধান মুলক কাজ করতেন। চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য-ভাস্কর্য,শিল্পের নিপুন পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন । কেউ কেউ লোহার সঙ্গে বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে সংকর ধাতু তৈরি করতেন। আবার কেউ কেউ খনিজ সম্পদ অন্বেষণের কাজে রত ছিলেন।

বিভিন্ন সেই মঙ্গল কাব্যে যে কামিল্য শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে তারা মূলত মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশে কর্মকার শ্রেণির অন্তর্গত। অতি প্রাচীনকাল থেকে লক্ষ করা গেছে এই জাতিটি মৌলিক চিন্তার অধিকারী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। যেমন জনৈক জনার্দন কর্মকার। তিনি তৈরি করেন সুবৃহৎ কামান জহান কোষা। জগন্নাথ কর্মকার ছাড়াও আধুনিক কালের প্রথম বাংলা মুদ্রণ লিপিকার পঞ্চানন কর্মকার প্রমুখের অবদানে জাতিটির গৌরব বৃদ্ধি করে তুলেছিল। যে ধারা বর্তমানেও টিকিয়ে রেখেছে তার বংশধরেরা।

কুম্ভকার জাতি: বাঙালি চির সুন্দর পূজারী। শিল্প-সাহিত্য, হস্তশিল্প এই সব বাঙালির প্রাণের দোসর। বাংলার মৃৎশিল্প তার নিজস্ব সম্পদ। বিশ্বকর্মা ও বৃত্তির নয়টি পুত্রের মধ্যে অন্যতম হিসেবে ধরা হয় কুম্ভকারকে। তৎকালে বাংলায় তাঁদের বহু শ্রেণির বিভাগ ছিল। তারা শারীরিক দিক থেকে যেমন সক্ষম ছিল তেমনি তারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলন থাকলেও কিন্তু বহু বিবাহ প্রচলন ছিল না। তারা ছিল 'নবশাখ' - এর অন্তর্ভুক্ত। তারা মূলত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। এখন তাদের মধ্যে সমাজের বহু সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, বিধি-বিধান বিলোপ ঘটেছে। বর্তমানে তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে এবং বিধবা বিবাহ চালু হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনযাপনের মান উন্নয়ন হচ্ছে। তাদের শিল্প নৈপুণ্য একসময় জগদ্বাসীর দরবারে হাজির হয়েছিল তার প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। বরভূধেরর মন্দির নির্মাণ করার পেছনে বিটপাল আর ধীমান পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবিংশ শতাব্দীতে ও এই জাতির বহু সন্তানেরা তাদের শিল্প নৈপুণ্যের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই-এক জন তারিনী চরন পাল, কার্তিক চন্দ্র পাল,

মূর্তি শিল্পী নিতাই চন্দ্র পাল, এছাড়াও মালদা জেলার ভেলুচরণ চরণ পাল। কৃষ্ণনগরের কুমোরটুলির শিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন মূর্তি গোটা বিশ্বে আজ পূজনীয়।

সমাজে অবস্থানগত দিক দিয়ে কুম্ভকারদের মধ্যে বহু শ্রেণি বিভাগ রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানের মালদা জেলার কুমোরদের মধ্যে যে শ্রেণিবিভাজন রয়েছে তা হলো-বাঙালি পাল, গোট্টা পাল, পচ্ছ্যা পাল, বাঁশরী পাল এরা মূলত আইহো, বুলবুলচণ্ডী, বাচামারি, পুরাতন মালদহ, সহ বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে। বর্তমানে বিভিন্ন ধাতু শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটায় মাটির তৈরি দ্রব্যের উপর মানুষের অত্যুৎসাহ আর নেই। তবে বিভিন্ন দেবীর মূর্তি নির্মাণে এবং নান্দনিক শিল্প কর্মের জন্য এখনো এই জাতিটি প্রশংসার পাত্র।

নরসুন্দর বা নাপিত জাতি: হিন্দুর জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এছাড়াও বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত নাপিত বা নরসুন্দর জাতিটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জাতিকে ক্ষৌর কার্যকরী জাতে তোলার দায়িত্ব অনেকটা তাদের উপর। সভ্য সমাজের মানুষকে সুন্দর করে তুলতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে নাপ্তা পশ্চিমবঙ্গে নাপিত। সংস্কৃতে নপ্ত>নাপিত শব্দটির উৎপত্তি। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে এক সময় নাপিতরা ঘৃণ্য ছিলনা। তাদের অন্য ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করতেন। আবার তাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করতেন। তবে তাদের সমাজের তৎকালীন সময়ে বহু শ্রেণি বিভাজন ছিল। চব্বিশ পরগনাতে হালদার নাপিত, কোলা পরামানিক, হংসদহা পরামানিক, মুজগাছি পরামানিক, খোট্টা পরামানিক এ রকমই বহু শ্রেণিতে বিভাজিত হয়ে ছিল। এদের মধ্যে যারা নিম্নবর্ণের বা নীচ জাতির ক্ষৌর কার্য করতেন তারা আবার নিম্নবর্ণের নাপিত বলে অবিহিত হতেন।

দেখা যায় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। এসময় অনেকে এরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেছিলেন। বর্তমানে অঞ্চলগত দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে ষলোটি শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। মালদহ জেলার বেশিরভাগ ই খোট্টা সম্প্রদায়ের নাপিত বসবাস করে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই জাতির বসবাস রয়েছে। বর্তমানে এই নরগোষ্ঠীর মানুষেরা বহু জাতির সান্নিধ্যে বসবাস করে ফলে তাদের সংস্কার-সংস্কৃতিতে মিশ্র প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ফলে তারা এখন অন্য জাতির সংস্কার সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে আবার তাদের বংশগত বিত্তিকে করে তুলেছে আধুনিকীকরণ। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বংশগত পেশাটি করে তুলেছে উন্নত তাই বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদা। তারা গড়ে তুলেছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক মানের পার্লার। বর্তমানে এই কাজটিতে মেয়েরা এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে পেশাটিকে ঘৃণ্য বা অসম্মানজনক কাজ হিসাবে না দেখে অন্যান্য জাতির মানুষের এ কাজে এগিয়ে এসেছে। পেশাটিকে উন্নত করে তোলার জন্য বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছে আধুনিকমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

গোপ বা গোয়ালা জাতি: অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পশু পালন করে এসেছে। পশু পালনকে কেন্দ্র করেই এই জনগোষ্ঠী তাদের জীবন-জীবিকা ও জীবনযাপন প্রনালী টিকিয়ে রেখেছে। গোপ শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়, গো পালন করে যে। মনসা মঙ্গল কাব্যে দেবী মনসা প্রথম এই গোপ জাতিকে কেন্দ্র করেই প্রচারশুরু করেছিলেন। গোপজাতি নিম্নবর্গীয় হলেও তাকে অন্যান্য জাতির মত ঘৃণ্য চোখে দেখা হতো না। তারা একত্রে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতেন। পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী জানা যায় তারা যদি বংশীয়। রিজলী সাহেব মনে করেন গোপ জাতির জন্ম হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হতে। ঘর্ম থেকেই গোয়ালা জাতির জন্ম। তাদের মধ্যেও বহু শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। পল্লর, গোপ, ঘোষ, আহীর, মধু গোয়ালা, মগল, এছাড়া আরো অনেক। গবাদি পশু পালন ও অন্যান্য পশুচারণ করার তাগিদে তারা স্থায়ীভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারেনি। ফলে তারা আর্থিক-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছিল তবে জাতিটির ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান ছিল। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের একাধিকবার জাতিটি শৌর্য বীর্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের ‘শ্রী কৃষ্ণকীর্তন কাব্য’-টি থেকে তৎকালীন সমাজের গোপদের সামাজিক অবস্থান, জীবন যাপন প্রণালী, বিভিন্ন সংস্কার-সংস্কৃতি, বিধি-বিধান রীতিনীতি, বিভিন্ন বিশ্বাস-কুসংস্কার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে গোপ জাতির জীবন-জীবিকায়,জীবন যাপন প্রণালী তে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ায় সমাজ জীবন থেকে দূর হয়েছে বিভিন্ন কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস। তারা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক জীবন ত্যাগ করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন যাপন করছে। স্বভাবে উগ্র গোপ জাতি অত্যাধিক শুরা পান করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলির ঘুরপাকে পড়ে একে অপরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সমাজে আর্থিক গত অবস্থান ও সমাজে পদমর্যাদাগত দিক থেকে এখনো তারা সম্পূর্ণরূপে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। অশিক্ষা -অজ্ঞতা, জীবিকা নির্বাহের প্রতিবন্ধকতা বর্তমানে তাদের উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা, নদীয়া,চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, এছাড়াও বিভিন্ন জেলাত তারা বসবাস করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ‘জন্মাষ্টমী’ উৎসব মহাধুমধামে সম্পন্ন করে।

তন্তুবায় বা তাঁতি: বাংলায় 'নব শাখ' বলে পরিচিত নয়টি জাতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য জাতি হল তন্তুবায়। অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় বস্ত্রশিল্প বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহু বৈদেশিক শক্তি বাংলায় চিরাচরিত ঐতিহ্যশালী বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করেছে। মধ্যযুগের বহু জাতি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলো। সামাজিক অবস্থানগত দিক দিয়ে বিচার করলে তাদের সমাজে স্থান মোটেই সম্মানজনক স্থানে ছিল না। অথচ তারাই মানব জাতির লজ্জা নিবারণ করত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানগত দিয়ে তারা ছিল সমাজের নিচুতলায়। চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে তারা 'নব শাখ'-এর অন্তর্ভুক্ত হন। সমাজে অবস্থানগত দিক দিয়ে তারা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা-পুরন্দরী, মধু করী, অশন তাঁতি, এছাড়াও বর্ধমানী,মান্দারনী, মগি, রাঢ়ী প্রভৃতি। বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক তারা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা ভাবে নাম ধারণ করে থাকে। বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা ও উন্নত মানের কাপড় তৈরীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করায় অল্প ব্যয় অল্প সময়ে অধিক পরিমাণের বস্ত্র উৎপাদন করে হলে বাংলার চেরাক ঐতিহ্যশালী হস্তচালিত তাঁত শিল্প ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে। জীবিকা গত দিক থেকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় সমাজে তাদের অবস্থান নিম্নমুখী হতে চলেছে।

মালাকার জাতি: মধ্যেযুগের একাধিক মঙ্গলকাব্যে এই জাতিটি উল্লেখ রয়েছে। তারা সমাজের শুদ্ধ শূদ্র নামে পরিচিত। সমাজে অর্থনৈতিক ও বর্ণগত দিক দিয়ে নিচুতলায় বসবাস করলেও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে উচ্চ বর্ণের মানুষ এই জাতিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। তাই তাদের তৎকালীন সময়ে একটি বিশেষ স্থান ছিল। সমাজে এদের অবস্থান ছিল বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ফুল যোগান দেওয়া। এছাড়াও পুষ্প চয়ন, দেব মন্দির ফুল যোগানো, বিবাহের টোপর, বিভিন্ন সোলার তৈরি খেলনা, ঘর সাজানোর সামগ্রী, ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতো। এদের স্পর্শ করা গঙ্গাজল ব্রাহ্মণরা স্পর্শ করেন। বর্তমানে মালদা জেলাতে মালাকারের দুটি শ্রেণিবিভাজন লক্ষ্য করা গেছে। যথা-ফুলকাটা মালীও দোকানি মালী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুলের দ্বারা অলংকরনের কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের নান্দনিক শিল্প সৌন্দর্য দিকটি জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। কবিকঙ্কন কৃত 'অভয়ামঙ্গল কাব্যে' কালকেতু নবনির্মিত গুজরাট রাজ্যে জাতিটির ফুল জোগানোর কাজে উজ্জল উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। কিন্তু বর্তমানে সমাজে তাদের আর ফুল ও শোলার কাজ নির্মাণের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তারা ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের বৃহত্তর ও কর্ম ক্ষেত্রে। শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি ঘটায় বা কেউ কেউ আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ায় সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূত্রধর শ্রেণি: অতি প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশে বিভিন্ন শিল্প, মঠ মন্দির নির্মাণে, স্থাপত্য শিল্প,কলা শিল্প, অঙ্কনশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সূত্রধর নামক জাতিটির কাছে মানব সমাজে ঋণী। কারন তারাই ভারতের শিল্প ও প্রাচীন ঐতিহ্যের নির্মায়ক ও রক্ষক। তারা নিজেদের বিশ্বকর্মার পুত্র বলে মনে করতেন। বাংলায় তারা পরিচিত ছিলেন সূত্রধর নামে। সমাজে তাদের পূর্বে অবস্থানগত দিক দিয়ে চারটি শ্রেণির ভাগ ছিল কিন্তু বর্তমানে বহু শ্রেণির ভাগ রয়েছে। অন্যান্য নিম্নবর্গীয় থেকে এদের অবস্থান একটু উচ্চে ছিল তাই ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এরা মূলত চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, এবং মালদাহ জেলাতে বসবাস করে। তবে মালদহ জেলায় প্রচুর পূর্ববঙ্গীয় সূত্র ধরে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। মূল কারণ সেখানকার রাজনৈতিক অরাজকতা এবং বিধর্মীদের অত্যাচার। তাই বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের মান সম্ভ্রম বাঁচাতে হাজার হাজার সূত্রধর বাঙালিরা নিজ বসত বাড়ি, জমির ভাগ করে নিঃস্ব হয়ে এদেশে এসে মালদায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। তবে সূত্রধর নামক জাতিটি ব্রিটিশ আমল থেকেই অন্যান্য জাতির মতোই তফসিলী জাতিভুক্ত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ,বিভিন্ন সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা তারা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন উৎসব পার্বণের মধ্যে বিশ্বকর্মা পূজাকে এদের প্রধান উৎসব বলে মনে করে। বর্তমানে সমাজে তারা কাষ্ঠ জাত আসবাবপত্র নির্মাণ করে দিনমজুর হিসেবে অবস্থান করছেন। বর্তমানে সামাজিক পদমর্যাদা এবং অবস্থান সবই তার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকে।

বারুই জাতি: পান চাষ কারীরা সাধারণত বরুই জাতি বলে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই তারা কমবেশি সংঘবদ্ধ বসবাস করে। তবে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, মালদাহ প্রভৃতি জেলাতে বারুদের দেখতে পাওয়া যায়। সমাজে অবস্থানগত দিক দিয়ে বারুইদের চারটি শ্রেণি বিভাজন রয়েছে। যথা রাঢ়ী, বরেন্দ্র, নাথান, কোটা। পূর্বেই এদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বিবাহ প্রচলন ছিল। মূলত সগোত্রের মধ্যেই এদের বিবাহ হয়। এদের সমাজে পুরুষেরা বহু বিবাহ করে থাকেন। এদের বিবাহের কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। এদের সমাজ ছিল গোষ্ঠী কেন্দ্রিক। বর্তমানে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে তাদের সামাজিক অবস্থানের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। জাতিটির স্বভাবমূলত নরম প্রকৃতির। বর্তমান সমাজে তাদের অবস্থান মধ্যম প্রকৃতির। তারা মূলত আচারনিষ্ঠ দেবী লক্ষ্মী, মনসা, চন্ডী দেবীর পূজা করে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ

কেউ লোকের মনোরঞ্জন দেবার জন্য বিভিন্ন মঙ্গলগীত যেমন মনসামঙ্গল বা মনসার ভাসান পালা করে গান গেয়ে ও অভিনয় করে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে থাকেন।

মুচি জাতি: বাংলায় জনজাতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ। সম্ভবত পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে বহুল পরিমাণে বাংলাতে প্রবেশ করেছে এই জাতিটি। সাধারনত গ্রামের ত্রিসীমানার বাইরে এদের বসবাস। এছাড়াও শহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে। এরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- মুচি, ঋষি, চামার, রবিদাস। এরা পশুর ছাল ছাড়িয়ে তা দিয়ে চামড়ার জুতো, ব্যাগ, আসবাবপত্র, বাদ্য যন্ত্র, তৈরি করে। সমাজে অবস্থানগত দিক থেকে তারা সমাজের একেবারে তলানীতে অবস্থান করে। জাতিটির উৎপত্তিতে প্রচলিত অনেক পুরান কাহিনী রয়েছে। অনেকের মতে এঁরা শিবের ঘাম থেকে উৎপত্তি হয়েছে। মধ্যযুগে তাদে দুটি শ্রেণিবিভাগ ছিল। বড় ভাগিয়া আর ছোট ভাগিয়া। এদের মধ্যে ছোট ভাটিয়ারা চর্মের কাজ করত। অশিক্ষা ও অসচেতনতা থাকায় তাদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটেনি। ফলে বর্ণহিন্দুরা তাদেরকে নানাভাবে ঠকিয়ে এসেছে এবং করেছে রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা শৈব বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী হলেও অন্যান্য দেব-দেবীকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করত। বর্তমানে তাদের সামাজিক অবস্থান নিম্নে। সমস্ত জাতি তাকে ঘৃনার চোখে দেখে। উচ্চ শ্রেণি সমাজ তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম দূরত্ব বজায় রেখে চলে। ফলে জাতিটি কর্মক্ষেত্রেও নানা বঞ্ছনার শিকার হয়। ফলে আর্থিক ও সামাজিক দিয়ে তারা উন্নত হতে পারছে না। জাতিটিকে সরকারিভাবে বিভিন্ন আইন ও প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হলে তারা শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে নানা সুবিধা পাচ্ছে। তাদেরকে যাতে কেউ অবজ্ঞার চোখে না দেখে তার জন্য সরকারি ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা নিম্নবিত্তচারী ফলে জীবন-যাপনের মান ও অনুন্নত।

যে সমস্ত জাতি-উপজাতির উল্লেখ করা হলো তারা মধ্যযুগে সাধারণত নিম্নবর্গীয় সমাজের পরিমণ্ডলের মধ্যে বসবাস করত। উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তাদের ছিলো না। ফলে উন্নত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো আসতে পারেনি। সমাজের বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করে তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে পারেনি। মধ্যযুগীয় ধর্ম ভাবনা সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি করে নবজাগরণের আলোর দ্বারা নিজেদরকে মেলে ধরতে পারেনি। সামাজিক সচেতনতার অভাব, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রভাব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সংকীর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামির গোলক ধাঁধায় পড়ে সমাজে একেবারে তলানীতে অবস্থান করে এই সমস্ত নিম্নবর্গীয় জনজাতি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গোষ্ঠী কেন্দ্রিক সমাজ এই সমস্ত নিম্নবর্গীয় জাতিকে করে রেখেছিল পদদলিত। সংকীর্ণ দলাদলি তাদেরকে একে অপরের থেকে করে রেখেছিল বিচ্ছিন্ন। তাদেরকে স্বাধীনভাবে ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ দেয়া হয়নি। মোটা ভাত মোটা কাপড় অর্থাৎ জীবনের ন্যূনতম চাহিদাটুকু সংগ্রহ করতেই জীবনের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। ধীরে ধীরে তাদের জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল। তারা একত্রিত হলো গড়ে তুলল বিভিন্ন সংগঠন। সমাজ হয়ে উঠল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যাক্তি স্বাধীনতা মুখ্য হয়ে দেখা দিল। তারা একত্রিত হতে শিখল। মধ্যযুগের ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এলো। নবজাগরণের ভাবধারায় শিক্ষিত হল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গড়ে তুলল প্রতিরোধ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘটল মেলবন্ধন। নিজ ক্ষমতাবলে প্রমাণ করলো তারা বিভিন্ন রোগের ভাইরাসের (সংক্রমণ) মত ছোঁয়াচে নয়। তারা উচ্চবর্ণের মতোই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। সামাজিক উত্তোরণ ঘটল তাদের। মধ্যযুগে নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজশ্রেণি শ্রেণির কথা গুরুত্বসহকারে ভাবা হয়নি আজকের মত। উচ্চ জাতির জনগোষ্ঠীর মানুষ সর্বদা নিম্নবর্গীদের করে রেখেছিল পদদলিত। কিন্তু বর্তমানে সেই চিত্রটি পুরোটা না হলেও অনেকটাই বদলে গেছে। সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণির উন্নয়নের জন্য লিখিত হয়েছে সংবিধান তাতে উল্লিখিত হয়েছে সাম্যের অধিকার, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, শিক্ষা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধ ন্যায় বিচার, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় উল্লিখিত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালি উৎপত্তি শীর্ষক প্রবন্ধ, 'বঙ্গদর্শন পত্রিকা', ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, মাঘ সংখ্যা।
২। রায় নীহাররঞ্জন, 'বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব', ২য় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০২ বঙ্গাব্দ। সৌজন্যে-বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি (একাদশ শ্রেণি) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পাবলিকেশন্স-বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। পৃষ্ঠা নম্বর-৮
৩। চক্রবর্তী রূপরাম, "ধর্মমঙ্গল কাব্য' ভূমিকা ও সম্পাদনাঃ অক্ষয় কুমার কয়াল। চতুর্থ মুদ্রন, আগস্ট ২০১৫, কাঙুর যাত্রাপালা যাত্রাপালা, ভারবী প্রকাশনা, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ২৫৮।
৪। মোঃ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত 'চর্যাগীতিকা' ঢাকা ১৯৭৩ খ্রীঃ, পদ সংখ্যা ১০।
৫। চক্রবর্তী রূপরাম, 'ধর্ম মঙ্গলকাব্য", "জাগারণ পালা", পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৩২।
৬। চক্রবর্তী রূপরাম, 'ধর্মমঙ্গল কাব্য', জাগরণ পালা, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৯৭।
৭। চক্রবর্তী ঘনরাম, 'ধর্মমঙ্গল কাব্য", সম্পাদক শ্রী পীযূষ কান্তি মুখপাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।